শব্দার্থ ও টীকা

11

অতীতের বোঝা

এস. ওয়াজেদ আলি

11.1 প্রস্তাবনা

ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। এই সভ্যতা বৈদিক যুগের।ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই বৈদিক যুগের উন্নত সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন।

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই কিছু গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তাই বলে অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই চলবে না। সভ্যতার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই নিজ নিজ জড়তা, অভিমান ত্যাগ করে একত্রে কাজ করতে হবে, তাহলেই জাতির পরিত্রাণ।

এই প্রসঙ্গে লেখক পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেমন গ্রিক, মিশরীয় এবং আরবীয়দের কথা বলেছেন। গ্রিকরাও একদিন উন্নতির শিখরে উঠেছিল। কিন্তু প্রাচীনের প্রতি মোহ তাদের পতন ডেকে আনে। পক্ষান্তরে আরব জাতি এক মেষপালক জাতি ছিল। হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবের ফলে সেদেশে অগ্রগতি শুরু হয় এবং প্রায় ৪০০ বছর আরবীয় সভ্যতা উন্নতির শিখরে ছিল। এমনকি ইউরোপীয় সভ্যতা আরবদের সংস্পর্শে এসেই উন্নত হয়। তারপর তারা এগিয়ে চলে। কিন্তু প্রাচীনতার বাঁধ আরবদের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক (বাধা) হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে বিভেদ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই গ্রাস করেছে। অতীতের বোঝা নিয়ে উভয়েই আজ বিভেদের জটাজালে আবদ্ধ।

11.2 উদ্দেশ্য

এই রচনাটি পড়ে আপনারা —

- জাতীয় সংহতি বিষয়ে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন।

11.3 মূল পাঠ

(1)

পুরাতত্ত্ববিদদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইংরেজদের পূর্ব-পুরুষেরা যখন নানা রকম রং মেখে সং সেজে উলঙ্গ শরীরে বন্য পশুর ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তখন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হত। এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই। কেউ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়লে তখনই কোনো না কোনো বিদ্যা-দিগ্‌গজ চোখ রাঙিয়ে উত্তর দেন, ''ওসব আর বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে না। ও-সব এবং আরও অনেকরকম জিনিস এদেশে ছিল। পরের কাছে শেখবার আমাদের আর কিছু নেই। যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক যুগে সবই ছিল। গোলযোগ ঘটেছে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুগে। তাই বলি আমাদের নূতন কিছু করতে হবে না, পুরোনো জিনিসগুলোর পুনরুদ্ধার করলেই সব চুকে যাবে।'' বক্তৃতার সঙ্গে কতগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিশমিশ মিশিয়ে পণ্ডিতমশায় নিরীহ শ্রোতার মানসিক ভোজনের মুখরোচক ব্যবস্থা করেন। শ্রোতা সাদাসিধা লোক, এত বক্তৃতা, এত শ্লোক আওড়ানো, হাত-পা নাড়া এবং মুখ ভেঙচানো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতর কিছু সার না থাকলে পণ্ডিত-প্রবর এতটা বাচালতা আর এতটা আত্মতুষ্টি কখনোই দেখাতে পারতেন না। শ্রোতার অত-শত ভাববার সময় নেই, পড়বারও সময় নেই, আর আলোচনা করবার সময় তো নেই-ই। তাছাড়া বেচারি সংসারী লোক, রুটিনের বাইরে যাবার ইচ্ছাও কম, আর সাহসও অল্প। পণ্ডিতের কথা তার মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসতার অনুকূল হওয়ায় সে মাছের টোপ গেলার মতো টপ করে সেটাকে গিলে ফেলল। ফলে পণ্ডিতের মর্যাদা বাড়ল, নব্যতান্ত্রিকদের যথেষ্ট নির্যাতন হল, এবং জনসাধারণের পক্ষে নিরুদ্বেগে নিদ্রাদেবীর আরাধনার সুযোগ ঘটল।

ক্ষতি হল কিন্তু দেশের। প্রকৃতির এই একটা মহা দোষ যে, সে বক্তৃতা শোনে না। প্রকৃতি কোন্ দয়াময় সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক রচিত হয়েছে, কী অণু-পরমাণুগুলোর উদ্দেশ্যবিহীন আকস্মিক সংযোগে ঘটেছে, সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মস্ত মতভেদ আছে। আমার কিন্তু ধারণা যে বঙ্গদেশীয়দের পক্ষে প্রকৃতির এই বক্তৃতার প্রতি বিরাগই তার অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্যহীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতির যদি মাথামুণ্ড থাকত, তাহলে এত বড়ো বড়ো বক্তৃতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এ দুরবস্থা হবে কেন?

সত্য কথা এই যে, আমাদের এত জ্ঞানগরিমা সত্ত্বেও, সত্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা বক্তৃতা করতে শিখেছি, বিকট মুখভঙ্গি করে ইংরেজি শব্দরাজির অপূর্ব সমাবেশ করতে শিখেছি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান করতে, তাকে নতশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে শিখিনি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাকত তাহলে ঐতিহাসিক কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীনকাল থেকে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসম্ভব তথ্য আমাদের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ করবার জন্য বার করবার ভান করতাম না এবং সেইগুলো নিয়ে অহংকারে স্ফীত হয়ে আধুনিক সমস্যা সকলকে উপেক্ষা করে 'তাইরে-নারে-না' গেয়ে ঘুরে বেড়াতুম না। এরূপ ব্যবহার ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। যদি কিছুর পরিচায়ক হয় তো সে জাতীয় দুর্বলতার ও নিস্তেজতার।

শব্দার্থ ও টীকা

পুরাতত্ত্ববিদ = প্রাচীনকালের ইতিহাসে পণ্ডিত ব্যক্তি।

নীতিশাস্ত্র = ন্যায়-অন্যায় ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে বিচার বিষয়ক গ্রন্থ।

বিদ্যাদিগ্‌গজ = অতিমূর্খ (বিদ্রূপে)।

আত্মসন্তুষ্টি = যথেষ্ট তৃপ্তির ভাব।

নৈতিক = নীতি বিষয়ক।

সামাজিক = সমাজের বিষয়ে।

নব্যতান্ত্রিক = নতুন বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

বিরাগ = বিরক্তি।

অনৈশ্বরিক = ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নয়।

অনুসন্ধান = খোঁজ-খবর।

কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন = কুয়াশা-আবৃত।

স্ফীত = ফেঁপে ওঠা।

(2)

পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন যে, প্রাচীনদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করলেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙা হল? আমার উত্তর এই যে, প্রাচীনকালের নজিরকে উপরোক্ত রূপ ভয়-ভক্তি-বিহ্বলনেত্রে দেখা এবং তার বিধানের পায়ে সসম্ভ্রমে আত্মসমর্পণ করা উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবী পরিবর্তনশীল, দুই মুহূর্তের অবস্থা কখনও এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে তার সমষ্টি আজ-কে কাল থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন করে ফেলেছে; তার দরুণই আজ হচ্ছে আজ আর কাল হচ্ছে কাল; কোনো পার্থক্য না থাকলে আমরা আজ আর কালের মধ্যে কোনো মতেই প্রভেদ করতে পারতাম না। বৈজ্ঞানিকের নজরে পৃথিবীর এক পলের অবস্থা আর এক পলের অবস্থা থেকে ভিন্ন। একথা যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতের কিংবা বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাতে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এসব সূক্ষ্ম তর্ক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সত্যের ওপর নির্ভর করে বিচার করা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভারতের দুই যুগের অবস্থাতে প্রভেদ বিস্তর ও বিরাট। প্রাচীনকালে (যথা— মনুর যুগে) ভারতে এক হিন্দুজাতিরই বাস ছিল। মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে ছিল না। তখনকার নীতিপ্রবর্তকদের কেবল এক হিন্দুসমাজের কথা ভাবতে হয়েছে। এখন কিন্তু দেশের অবস্থা একেবারে বদলে গেছে। এখন এদেশে হিন্দু ছাড়া মুসলমান, পারসি প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা বাস করছে। বিদেশিরা এখন এদেশের রাজা হয়েছেন। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এখন এদেশের লোকের পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। এইসব নূতন ঘটনা ঘটাতে দেশে নূতন নূতন জীবন-সমস্যা এসে জুটেছে। এসব সমস্যার কিরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু এবং তাঁর সমসাময়িকদের ভাববার সুযোগ হয়নি; সুতরাং এসব বিষয় তাঁরা কিছুই লিখে যাননি। এখন হিন্দুদের উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যেই এসব সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। মনু যখন হিন্দুর সামাজিক শ্রেণি-বিভাগের প্রবর্তন করেন, তখন ইউরোপের democratic হাওয়া এদেশে আসেনি, এখন কিন্তু এসেছে এবং তেড়েই এসেছে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে থাকে তাহলে ভারতবর্ষ থেকে তার লোপ পাবার সম্ভাবনাই বেড়ে যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ-সকল সত্য থেকে কেবল একটিমাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং সেটা এই যে নূতন যুগের নূতন সমস্যার নূতন মীমাংসার দরকার।

প্রাচীন গ্রিসের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিত সোলোনকে (Solon) বলেন ''তোমাদের গ্রিকদের চরিত্র বালকের মতো; তোমাদের মধ্যে না-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।'' মিশরি যাকে নিন্দনীয় বলে বিদ্রূপ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রিস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল; তাদের বাল-সুলভ চঞ্চলতা ও অসন্তোষই তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে তুলেছিল। যে-দিন এই বালস্বভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে-দিন তারা জাতীয় কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে পূর্বকীর্তির চর্বিত চর্বণে প্রবৃত্ত হল সেইদিন থেকে গ্রিসের অধঃপতনও শুরু হল।

যা গ্রিসে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষপালক বর্বর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ''আল্লাহো আকবর'' রবে সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। মহাপুরুষদত্ত মন্ত্রের ভীমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাষ্পনির্মিত সৌধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল; আরব সভ্যজগতে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন হয়ে মৃতপ্রায় সভ্যতাকে নবজীবন দান করল। দেশ বিদেশ দমন করে, পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে, সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্থন করে আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্ব। আরবের এই উন্নতি পৈতৃক প্রথার অনুসরণে হয়নি। হজরত মোহাম্মদের পূর্বকালীন অবস্থাকে তারা ''আইয়ামে জাহেলিয়াৎ'' (অন্ধকার যুগ) বলত। হজরতের সময় থেকে

বিহ্বলনেত্রে = শ্রদ্ধা ও ভীতিভূত চোখে

এক পলের = এক মুহূর্তের।

মনু = ইনি ব্রহ্মার দেহ থেকে উদ্ভূত। সেইজন্য এঁর নাম স্বয়ম্ভু-মনু। মনে করা হয় এঁর পুত্রকন্যাগণ থেকে মানুষ জাতির বিস্তার, তাই তাদের বলা হয় 'মানব'। ইনি ব্রহ্মার কাছ থেকে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই ধর্মশাস্ত্রই ''মনুসংহিতা'' নামে খ্যাত। মনুর যুগ বলতে এই ঋষির সমসাময়িক যুগকেই বোঝানো হয়েছে। মনুর যুগে ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল।

democratic = গণতন্ত্র সম্পর্কীয়।

মীমাংসা = বিরোধ সমস্যা প্রভৃতির সমাধান।

রঙ্গমঞ্চে = যুদ্ধক্ষেত্রে।

ভীমনাদ = উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা।

মন্থন = মন্থিত করা।

হজরত মোহাম্মদ = আল্লার প্রেরিত দূত। ইনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। তাঁকে পয়গম্বর নামে অভিহিত করা হয়।

আরম্ভ করে প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত আরবেরা ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিত্যনতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিল এবং নানা দিকে নূতন নূতন experiment করেছিল। তার পর প্রাচীনতার বাঁধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহারজীবী (ফকিহ) এবং পুরাতত্ত্ববিদদের (মেহাদ্দেস প্রভৃতি) ইজ্জত বেশি হল। এইখান থেকেই আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

শব্দার্থ ও টীকা

experiment = অনুসন্ধান, পরীক্ষা।

ইজ্জত = সম্মান।

(3)

সভ্যতা দেখতে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর-এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায়, তার দোষে। আরবের জরা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত স্রোতস্বতীর ন্যায় তাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। সে স্রোত এখনও থামেনি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মতোই authority -র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মতো অটল ভক্তি ছিল। Aristotle -এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেছে। এখন জীবনের আদর্শের সঙ্গে অতীতের বিধি-নিষেধের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না। তাঁরা এখন নিত্যনতুন জিনিসকে নিয়ে experiment করছেন, এক নীতি ছেড়ে অন্য নীতি ধরছেন, এইরূপে তাদের আশা ও উদ্যমপূর্ণ জীবন কেটে যাচ্ছে। রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়ছে বই কমছে না।

তামসিক = ঘোর অন্ধকার।

authority = কর্তৃপক্ষ, শাসক।

Aristotle = প্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্য তত্ত্বের স্রষ্টা।

ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়। ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যেও একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তখন তাদের মধ্যে বার্ধক্যের দুর্বলতা আসেনি। যৌবন-সুলভ চঞ্চলতার প্রসাদে তারা নানা নীতির অনুসরণ করেছিল, নানা মতের প্রবর্তন করেছিল, নানাবিধ সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করেছিল এবং নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কাব্য ও কলাবিষয়ক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় experiment করেছিল। ক্রমে তাদেরও বার্ধক্য উপস্থিত হল। জীবনে জড়তা এসে পড়ল। ষোড়শোপচারে প্রাচীনতার পুজো আরম্ভ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দুজাতি নির্জীবতার একটা মস্ত উদাহরণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

ষোড়শোপচারে = ঘটা করে।

আমাদের Nation — হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুয়ে মিলে গঠিত। এই দুই সমাজই নিজেদের জীবনের মূল্য ভুলে গিয়ে প্রাচীন প্রথার অনুসরণের বৃথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করছে। এর ফল যে বিষময় হচ্ছে, সে বিষয় সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। চোখ খুলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন যে এ পৃথিবী এক অনন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র। এখানে মানুষে-মানুষে, মানুষে-পশুতে এবং পশুতে-পশুতে অবিরাম জীবন সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়, অন্যেরা লোপ পেয়ে যায়। অতীতের গুরুভার ঘাড়ে করে যার পক্ষে চলাই কঠিন, তার পক্ষে এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আশা কোথায়? আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে আর ক'দিন চলবে? অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না? কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি বিশেষ করে হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ করছি। এদেশে হিন্দু-মুসলমান দুজনেই নিজ নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েছে, দুজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে দুর্দশা।

Nation = জাতি।

উদ্ভাবন = আবিষ্কার।

(সংক্ষেপিত)

11.4 বিষয়ের রূপরেখা

11.4.1 পুরাতত্ত্ববিদদের মুখে . . . . . জাতীয় দুর্বলতার ও নিস্তেজতার

বক্তব্যসার:

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান অসামান্য অগ্রগতির প্রশ্ন তুললেই পুরাতন ব্যবস্থার গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা বৈদিকযুগের উদাহরণ দেন। মনুর যুগে ভারত উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল বলে অহংকার করেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে এমন জটিল করে তোলেন যে শ্রোতারা বক্তার পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে ভীত হয়ে চুপ করে থাকে। আসল সত্য চাপা পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সত্যের আশ্রয়ে জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

দুর্দশা[illegible]থা।

মন্তব্য:

প্রাচীন সংস্কারকে গ্রহণ করে, প্রাচীন পথকে অনুসরণ করে চললে মানুষের ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত কিম্বা জাতিগত কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। কারণ জগতে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটছে। মনুর যুগ আর আজকের যুগ এক নয়। মনুর যুগের সামাজিক শ্রেণিবিভাগ বর্তমানে শ্রেণিসংঘর্ষ তৈরি করছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বর্ণবিভেদ মেনে নেওয়া যায় না। বর্ণবিভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ তৈরি করে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

শুধু ভারত নয়, গ্রিস দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। এই সারল্য নিয়েই তারা উন্নতির শিখরে উঠেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা তাদের স্বভাব পরিত্যাগ করে পূর্বের সংস্কারে মন দিল, তখনই তাদের জাতীয় উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হল।

প্রাচীন আরবদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই সত্য লক্ষিত হয়। সরল মেষপালক এক জাতি হজরত মোহাম্মদের প্রভাবে সভ্যতার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু সে মাত্র ৪০০ বছর। যেই মাত্র তারা প্রাচীন পথের অনুসরণ শুরু করল, অমনি আরব সভ্যতার উন্নতি খর্ব হতে শুরু করল। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার, আরবের কাছ থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে এক সুসভ্য জাতি হিসাবে প্রশংসা লাভ করেছে।

শ্রেণীসংঘর্ষ = দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিরোধ।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.1

পাঠ্যাংশটুকু ভাল করে পড়ুন এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

1. প্রাচীন যুগ বলতে কোন্ যুগের কথা বলা হয়েছে?
2. ভারতের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে?
3. আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ কী?
4. ঐতিহাসিক কুহেলিকা বলতে লেখক কী বলতে চেয়েছেন?

খর্ব = হ্রাস পাওয়া।

শব্দার্থ ও টীকা

11.4.2 পাঠক জিজ্ঞাসা করবেন যে . . . . . আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

বক্তব্যসার:

পরিবর্তনশীল এই জগৎ। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নানা প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার, সামাজিক রীতিনীতির প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ আজ আর কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রাচীন গ্রিস ও মিশরীয় সভ্যতার পরিবর্তন ঘটেছে। আরব সভ্যতাও মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল।

মন্তব্য:

প্রাচীন সংস্কারকে গ্রহণ করে, প্রাচীন পথকে অনুসরণ করে চলতে মানুষের ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত কিংবা জাতিগত কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। কারণ জগতে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটছে। মনুর যুগ আর আজকের যুগ এক নয়। মনুর যুগের সামাজিক শ্রেণিবিভাগ বর্তমানে শ্রেণিসংঘর্ষ তৈরি করছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বর্ণবিভেদ মেনে নেওয়া যায় না। বর্ণবিভেদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ তৈরি করে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

শুধু ভারত নয়, গ্রিস দেশের প্রাচীন অধিবাসীরা সকলেই ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা তাদের স্বভাব পরিত্যাগ করে পূর্বের সংস্কারে মন দিল, তখনই তাদের জাতীয় উন্নতি পদে পদে ব্যাহত হল।

প্রাচীন আরবেরাও হজরত মোহাম্মদের প্রভাবে সভ্যতার গৌরবময় শিখরে আরোহণ করেছিল। কিন্তু সে মাত্র ৪০০ বছর। যেই মাত্র তারা প্রাচীন পথের অনুসরণ শুরু করল, অমনি আরব সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হল।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.2

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখুন। একটি উত্তর করে দেখানো হল।

1. প্রাচীনকালের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করলেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙা হল?

   হ্যাঁ / না

   ✓

2. বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার কোনো পার্থক্য নেই।
3. প্রাচীনকালে মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে (ভারতে) ছিল না।
4. পাঠে বর্ণিত সমস্যার কীরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু কিছুই লিখে যাননি।
5. মনু হিন্দুর সামাজিক শ্রেণি-বিভাগের প্রবর্তন করেন।
6. মিশরি সোলোন গ্রিকদের কতগুলি গুণকে নিন্দনীয় বলে বিদ্রুপ করেছিলেন, তার ফলে গ্রিসের অবস্থা কী হয়েছিল?
7. প্রাচীন আরবীয়রা কীরূপ জাতি ছিল?
8. কে মৃতপ্রায় আরবসভ্যতাকে নবজীবন দান করেছিলেন?
9. 'আইয়ামে জাহেলিয়ৎ' শব্দের অর্থ কী? আরব দেশে কোন্ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়াৎ বলা হত?

10. আরবের উন্নত অবস্থা কোন্ সময় থেকে আরম্ভ হল এবং কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল?

11. আরবীয়দের উন্নতির প্রবাহ কীভাবে বন্ধ হল?

11.4.3 সভ্যতা দেখতে পাই কালক্রমে . . . . . এবং সে দশার নাম হচ্ছে দূর্দশা।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

আরবীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয় সভ্যতা উজ্জীবিত হল। তা উন্নতির চরম শিখরে উঠল। অথচ আরবে উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা কিন্তু authoritarian অর্থাৎ স্বৈরতান্ত্রিক ছিল। অ্যারিস্টটলের ছিল অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব। এখন ইউরোপীয়দের সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তারা তাদের সভ্যতা নিয়ে গর্বিত।

সার্বভৌম = সর্বাধিক।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দু'য়ে মিলে ছিল এক জাতি, এক প্রাণ, মহান ভারতীয় (জাতি)। কিন্তু বর্তমানে আমরা ভারতবাসীরা সে-কথা ভুলে পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত। এখন হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই নিজেদের বিভেদ ভুলে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই প্রকৃত জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব।

মন্তব্য:

প্রবন্ধটি ভারত বিভাগের পূর্ববর্তী সময়ের রচনা। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়। জন্ম নেয় ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ। পাকিস্তান আবার ১৯৭১/৭২ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। লেখক অবিভক্ত ভারতবর্ষের অগ্রগতির বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 11.3

সঠিক উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দিন ঃ—

1. ''ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল।' —
   'তামসিক যুগ' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে —
   (i) সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে এমন যুগ।
   (ii) যে যুগে উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হয়েছে এমন।
   (iii) অন্ধকার যুগ।
2. ''রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়ছে বই কমছে না।'' — 'আত্মশক্তি' বলতে বোঝায় —
   (i) নিত্যনতুন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার শক্তি।
   (ii) নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা।
   (iii) নিজেদের সভ্যতার অগ্রগতির শক্তি।
3. ''ক্রমে তাদেরও বার্ধক্য উপস্থিত হল'' — এখানে 'বার্ধক্য উপস্থিত হল' বলতে বোঝান হয়েছে —
   (i) জীবনে জড়তা এসে পড়ল।
   (ii) সভ্যতার অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ হল।

শব্দার্থ ও টীকা

(iii) প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

4. '' অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না।' অতীতের বোঝা বলতে এখানে বোঝান হয়েছে —
   (i) প্রাচীন প্রথার অনুসরণ।
   (ii) অবিরাম জীবন-সংগ্রামের ব্যর্থতার ভার।
   (iii) অতীতের পূর্বসূরিদের দুর্দশার ভার মোচন।

5. 'ইউরোপে তামসিক যুগের অবসান হল।' ইউরোপের 'তামসিক যুগ' বলতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে?

6. 'ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেছে।' এখানে 'সে মনোভাব' বলতে কোন্ মনোভাবের কথা বলা হয়েছে?

7. 'ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়।" — 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

8. 'আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে আর ক'দিন চলবে?" — 'আমরা যেভাবে চলছি' বলতে লেখক আমাদের কীভাবে চলার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

11.5 আপনি যা শিখলেন

1. বিভিন্ন জাতি একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব।
2. প্রাচীন ভারতে একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।
3. প্রাচীন ভারতে বৈদিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, পরবর্তী মধ্যযুগে মুসলিম এবং তারপরে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়।
4. ইউরোপে যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, ভারতে তখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়নি। এখন ভারতে গণতান্ত্রিক (Democratic) ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।
5. ভারতবর্ষে বর্তমানে সমস্ত সমস্যারই মীমাংসা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে।

11.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. ভারতের বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, আলোচনা করুন।
2. ভারতবর্ষের যুগবৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখুন।
3. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ভারতে বর্তমানে কোন্ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?
4. ''এর ফল যে বিষময় হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।' — 'এর ফলে' বলতে কোন্ বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। কীভাবেই বা জীবন বিষময় হয়ে উঠছে — আলোচনা করুন।
5. ''অতীতের বোঝা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের দেহে কখনোই জন্মাবে না?" — অতীতের বোঝা বলতে এখানে কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলা হয়েছে, আলোচনা করুন।

শব্দার্থ ও টীকা

11.8 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

11.1

1. ভারতবর্ষে বৈদিক যুগকে প্রাচীন যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে।
2. ভারতের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে — যথা (ক) প্রাচীন যুগ; (খ) মধ্যযুগ; (গ) আধুনিক যুগ।
3. সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দূরবস্থার প্রধান কারণ।
4. সত্যের প্রতি অনুসন্ধান করতে শেখা, তাকে নতশিরে মেনে নেওয়া এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া আমাদের উচিত। এই শিক্ষা আমাদের নেই। লেখক সেই অভাবজনিত কারণকেই ঐতিহাসিক 'কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন' বলেছেন।

11.2

1. না,
2. না,
3. হ্যাঁ,
4. হ্যাঁ,
5. হ্যাঁ,
6. গ্রিস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল।
7. প্রাচীন আরবীয়রা মেষপালক বর্বর জাতি ছিল।
8. হজরত মোহাম্মদ মৃতপ্রায় আরবকে নবজীবন দান করেছিলেন।
9. 'আইয়ামে জাহেলিয়াৎ' — এর অর্থ অন্ধকার যুগ।
10. হজরতের সময় থেকে আরবের উন্নত অবস্থা শুরু হল। এই অবস্থা প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত ছিল।
11. তারপর যখন তারা (আরবীয়রা) প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করতে শুরু করল তখন তাদের উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল।

11.3

1. (ii)
2. (ii)
3. (i)
4. (i)
5. আরবদের হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের সুসভ্য করে গড়ে তুলল। তাদের তামসিক যুগের অবসান হল।
6. ইউরোপের 'সে মনোভাব' বলতে ইউরোপের প্রাচীন authoritarian বা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে রাজা যা বলত, তাই গ্রাহ্য হত। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে।
7. পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। জগৎ পরিবর্তনশীল। ভারতবাসীকে এ-সত্য মানতে হবে। প্রাচীন গৌরব নিয়ে গর্ব করলে চলবে না।
8. আমরা যেভাবে চলছি বলতে আমরা এখনও প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করে চলেছি। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই একাত্মতা ভুলে পৃথক পৃথকভাবে অতীতের অনুশীলন, অতীতের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শব্দার্থ ও টীকা

জাগতিক উন্নতির কোনো প্রভাবই আমাদের উপর পড়ছে না। কাজে কাজেই আমরা নিজেদের কৃত দুর্দশার পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছি।

লেখক পরিচিতি

১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখে হুগলি জেলার বড়জাতপুর অঞ্চলে এস. ওয়াজেদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসের ৬ তারিখে। কেমব্রিজ থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একজন লেখক হিসাবে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি, রম্যরচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। 'মাশুকের দরবার', 'প্রেমের মুসাফির', 'ভারতবর্ষ', 'জীবনের শিল্প', 'খেয়ালের ফেরদৌস' প্রভৃতি প্রায় কুড়িটি গ্রন্থের তিনি লেখক। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'ভবিষ্যতের বাঙালী'। ইংরেজি ভাষাতেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

সমধর্মী রচনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরাসী মনীষী গিজো ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাঁহার মত নিম্নে উদ্ধৃত করি।

''তিনি বলেন, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তীকালে, কি এশিয়ায় কি অন্যত্র, এমনকি প্রাচীন গ্রিস-রোমেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উঠিয়াছে এবং একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, তাহার আচারে বিচারে, তাহার অবয়ব বিকাশে, সেই একটি স্থায়ী ভাবেরই কর্তৃত্ব দেখা যায়। যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিত শাসনতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল; তাহার আচারব্যবহারে, তাহার কীর্তিস্তম্ভগুলি ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

''সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃভাবের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

''এইরূপ এক ভাবের কর্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রিস অতি আশ্চর্য দ্রুতবেগে এক অপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোনো জাতিই এত অল্পকালের মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু গ্রিস তাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার অবনতিও বড়ো আকস্মিক। যে মূলভাবে গ্রিক সভ্যতায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল তাহা যেন রিক্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল; আর কোনো নূতন শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না।

''অপরপক্ষে, ভারতবর্ষে ও ইজিপ্টেও সভ্যতার মূলভাব এক বটে, কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল; তাহার সরলতায় সমস্ত যেন একঘেয়ে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টিকিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই এক জায়গায় আসিয়া বন্ধ হইয়া গেল।''